# শিল্পী সংগ্রামী সঙ্গীতাচার্য্য সাধন সরকার

## শ্রদ্ধাঞ্জলি

শিল্পী সাধন সরকার। খুলনার সাংস্কৃতিক অঙ্গণে এক অসামান্য নাম। আগামী ১৫ জুন তাঁর এগার তম প্রয়াণ বার্ষিকী।

পঞ্চাশ দশকের গোড়ার দিকে দেশ ও কালের এক শূন্যতার মাঝে শিল্পী হিসেবে খুলনার প্রথম আত্মপ্রকাশ ঘটে সাধন সরকারের। তখন ক্রমশঃ শুধুমাত্র রবীন্দ্র-নজরুল জয়ন্তীর সীমানা ছাড়িয়ে বিভিন্ন রকমের সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডের বিস্তৃতি ঘটতে শুরু করেছে।

১৯৫২ এর ভাষা আন্দোলনের পটভূমিকায় তখন পূর্বপাকিস্তানের রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক অবস্থা বেশ উত্তপ্ত। তারই ধারাবাহিকতায় খুলনার বেশ কিছু প্রতিভাবান প্রগতিশীল সংস্কৃতিকর্মীর সমন্বয়ে ১৯৬৩ সালের প্রতিষ্ঠা লাভ করে দক্ষিণ বাংলার একমাত্র প্রগতিশীল সাংস্কৃতিক সংগঠন সন্দীপণ। যার নেতৃত্বে ছিলেন সাংস্কৃতিক আন্দোলনের অগ্রপথিক নাজিম মাহমুদ, অধ্যাপক খালেদ রশীদ গুরু। আর এ সংগঠনের অন্যতম প্রাণ পুরুষ ছিলেন সাধন সরকার। সাধন সরকার ছিলেন এ সংগঠনের অনুষ্ঠান পরিকল্পনার মূল নেতৃত্বে। মিছিলের গান বাঁধা, সুর করা রিহার্সেল করা ইত্যাদি বিষয় ছিল তার প্রধান কাজ। তখন তিনি ছিলেন অন্যরকম এক মানুষ।

শিল্পী সাধন সরকার ছিলেন গণসংগীতের এক অনন্য রূপকার, নিবেদিত প্রাণ। নাজিম মাহমুদ, কবি আবু বকর সিদ্দিক সহ অনেক খ্যাতিমান গীতিকারের গানে তিনি সুর করে গেছেন। নাজিম মাহমুদের কথায় সাধন সরকারের সুরে আজো আমরা একুশে ফেব্রুয়ারী এলে শুনতে পাই, "কৃষ্ণচূড়া আর রক্ত পলাশে" অথবা "আমাদের চেতনার সৈকতে"। আবু বকর সিদ্দিক এর লেখা "বেরিকেড বেয়নেট বেড়া জাল" স্বাধীনবাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে প্রচারিত হবার পর জনমানুষের মধ্যে ব্যাপক সাড়া জেগেছিল। আরো অসংখ্য কালজয়ী গান রয়েছে তাঁর।

খুলনাতে বহু সাংস্কৃতিক সংগঠনের সাথে তিনি জড়িত ছিলেন। তাঁর রয়েছে অসংখ্য ছাত্র-ছাত্রী, যারা অনেকেই আজ স্ব-স্ব ক্ষেত্রে যশস্বী।

এই গুণী শিল্পী সাধন সরকার ৬৩ বছর বয়সে ১৯৯২ সালের ১৫ জুন বেশ কিছুদিন অসুস্থ থাকার পর আমাদের মায়া ছেড়ে চলে যান ইহলোক ত্যাগ করে।তিনি ছিলেন আমাদের গর্ব, আমাদের অহংকার।

আজকে আমরা আমাদের অহংকার এইগুণী শিল্পীকে শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করার জন্য আমাদের সাহিত্য-সাময়িকীর কিছুটা অংশ তাঁর উদ্দেশ্যে নিবেদন করেছি। আগামী ১৫ জুন তাঁর ১১তম প্রয়াণ বার্ষিকী।

সাধন সরকার প্রগতিশীল সাংস্কৃতিক আন্দোলনের মাধ্যমে সমাজ পরিবর্তনের স্বপ্ন দেখতেন। তিনি শুধুমাত্র শিল্পীই ছিলেন না। তিনি ছিলেন শিল্পের পূজারী, সাংস্কৃতিক আন্দোলনের অন্যতম সংগঠক, কর্মী, সর্বোপরি তিনি ছিলেন গণ সংগীতের স্রষ্টা।

নজিম মাহমুদ ছিলেন সাধন সরকারের অত্যন্ত আপনজন। নাজিম মাহমুদ সাংস্কৃতিক সংগঠক হিসেবে নিবেদিত প্রাণপুরুষ ছিলেন। তিনিও আজ প্রয়াত। প্রসঙ্গত একটি অনুষ্ঠানে তাঁর জীবনের শেষ ভাষন আজকের সংখ্যায় প্রকাশিত হল।

আজকে আমরা যারা সংস্কৃতিচর্চা করি, আসুন এই শিল্পীদ্বয়ের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে আগামী দিনে সাংস্কৃতিক আন্দোলনকে সম্মুখে এগিয়ে নিয়ে যাই-তাহলেই ঐ সংগ্রামী শিল্পীদের প্রতি যথার্থ শ্রদ্ধা জানানো হবে।

**প্রদীপ রাহা**
বিভাগীয় সম্পাদক
সাহিত্য সাময়িকী

# আমার বাবা-সাধন সরকার

## সুতপা দে সরকার

বাবাকে নিয়ে লিখতে হবে। ভাবিনি। আমার বাবা-সাধন সরকার, এতটোই সাধারণ ও সহজ জীবন যাপন করতেন যে, কখনই প্রকাশ পায়নি উনি বড় মাপের একজন। আর তাই ভাবনাটা আসেনি কখনও। আমার স্বল্প বিস্তৃত বুদ্ধি দিয়ে মনে হয়েছে, আমার বাবা ছিলেন একজন সংগীত সাধক। নিজেই একটি পূর্ণ প্রতিষ্ঠান। তাঁর সমস্ত সাধনা ছিল সংগীতকে ঘিরেই। বাবা ছিলেন সকলের তথা জনগণের। তারা প্রত্যেকে বিভিন্নভাবে জানে বাবাকে। আমি তাঁর সন্তান, আমার কিছু একান্ত নিজস্ব অনুভূতির কথাই লিখতে চাই। তাঁর সৃষ্টিকর্ম, সংগীতাঙ্গণে দীপ্ত পদচারনা, স্বীকৃতি এসব নিয়ে লিখতে চাই না।

এই স্বল্প পরিসরে সবকিছু লেখা সম্ভবও নয়। তাই কয়েকটি বিশেষ দিকের কথা লিখছি।

ছোটবেলা থেকে দেখেছি, বাবা খুব সাধারণভাবে প্রতিটাদিন পার করতেন। একসেট পায়জামা, পাঞ্জাবী, তা যতদনি ব্যবহার করা যায় তা পরেই চলেছেন। এদিকে তাঁর ছাত্র-ছাত্রীদের উপহার দেওয়া সারিবদ্ধ পায়জামা-পাঞ্জাবীর ভাঁজে দাগ পড়ছে। কোন অনুষ্ঠানে যাচ্ছেন তো ওই সপ্তাহ ধরে ব্যবহার করা কাপড় পরেই রওনা হলেন। আমি বড় হবার পর প্রায় জোর করেই সেই সব জামা কাপড়ের ভাঁজ ভাঙ্গিয়েছি। বাবা হেসে বলতেন, আমি সাধন সরকার সে কথা সবাই জানে ও চেনে আমাকে, তা ময়লা কাপড় পরলেও চিনবে। নতুন কাপড়ের দরকার কি?

"মেসোমশাই এর মনটা শিশুর মত" আমার গৃহশিক্ষক বলতেন। আমিও তাই দেখেছি। আমার ছেলেবেলার সব খেলার সাথীদের সাথে বাবা এমন মিষ্টি ও সরল ব্যবহার করতেন, মনেই হতো না উনি একজন বড় মাপের মানুষ। আর বাচ্চাদের সাথে তারাই ভাল মিশতে পারে যাদের মনটা শিশুসুলভ। কোন রকম ঘোরানো প্যাঁচানো, কুটবুদ্ধির বহিঃপ্রকাশ আমি কখনই দেখিনি বাবার মধ্যে। তাঁর সুন্দর মনের আরও একটি দিক হচ্ছে পশুপাখির প্রতি ভালবাসা। ছোটবেলা থেকে বাড়ীতে দেখেছি বিভিন্ন পাখি পোষার ব্যবস্থা।এবং এদের খাদ্য, খাবার এসবেও তাঁর সুনজর। একটি বিড়াল যার নাম দিয়েছিলেন টন। বাইরে থেকে বাবা এলেই ছুটে আসত। বাবাও ওকে কোলের মধ্যে নিয়ে আদর করতেন।

বাবা আমাদের সব সময়ই বলতেন মানুষকে বিশ্বাস করবে। কখনও মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারাবে না। তিনি নিজেও তাই করতেন। এজন্য তাঁকে অনেক মানসিক কষ্টও সহ্য করতে হয়েছে। নির্দিষ্ট কিছু মানুষের কাছ থেকে।

সৃষ্টিশীল সব কাজের প্রতিই দেখেছি তাঁর অপার আগ্রহ। ডাক্তার বন্ধুর কাছ থেকে হোমিওপ্যাথি সম্পর্কে জানা, সেলাই মেশিনে কাজ করতে পারা তারই পরিচায়ক। আমার শৈশবের সমস্ত ফ্রকই ছিল বাবার নিজের তৈরী। ঠাকুরদাদার সময়ের বড় দেয়াল ঘড়িটা নষ্ট হতো প্রায়ই। আর বাবা আমাকে সঙ্গে নিয়ে বসে যেতেন ঠিক করতে। ঠিকও করতেন। অধৈর্য্য ছোট্ট আমি সারানোর সরঞ্জামাদি এগিয়ে দিতাম।

দাবা, কেরাম এমন কি লুডু পর্যন্ত খেলতে শিখেছি বাবার কাছ থেকে। অবসর সময় পেলেই আমাকে ডেকে নিয়ে বসতেন দাবা খেলতে। আর মির্জাপুর রোর্ডের খেলাপাগল এমন যুবক, কিশোর নেই যারা, আমাদের বাড়ীর সামনের বারান্দায় জমে ওঠা আসরে কেরাম খেলেনি। এবং ঐ অসমবয়সী সকলের সঙ্গেই সমান উদ্দীপনায় বাবাকে দেখেছি কেরাম খেলতে। রেডিও, টেলিভিশনে ক্রিকেট ফুটবল খেলা দেখা ও শোনাতেও দেখেছি সেই একই উদ্দীপনা।

গল্পের বইয়ের প্রতি ছিল বাবার দারুণ ভালবাসা। সব রকমের বই তন্ময় হয়ে পড়তে দেখেছি তাঁকে। বিভিন্ন ছাত্র-ছাত্রীদের বাসা থেকে এনে পড়তেন। আমাদের বাড়ীতেও প্রচুর বই ছিল বাবার সংগ্রহে। ভাল ভাল ছোটদের ও বড়দের গল্প। সেই সব বই পড়তে বাবা আমাকে উৎসাহ দিতেন। বাবার কাছ থেকেই এভাবে বইকে ভালবাসতে শিখেছি আমিও। গান, বই, খেলা এসব হলে আর খাওয়া, ঘুম না হলেও চলত।

এই ছিলেন আমার বাবা-সাধন সরকার। তাঁর নিজস্ব, সংগীতের ব্যাপক বিস্তৃত জগৎটার বাইরে একজন অতি সাধারণ মহামানব। আর মহামানবতো তাঁরাই যারা সাধারণত্বের মধ্যে থেকেও অসাধারণ হন। তিনি ছিলেন আমাদের অভিভাবক এবং বন্ধু। আর পাঁচজন বাবার মতোই কমবেশী দায়িত্ব পালন করেছেন সংসার ও সন্তানদের প্রতি। শুধু আমি আমার পূর্ণ দায়িত্ব এবং কর্তব্যটুকু করতে পারিনি বাবার প্রতি। সেই সুযোগ ঈশ্বর দেননি। আসলে ভালবাসায় কাউকে বাঁধা যায় কিন্তু আটকে রাখা যায় না। আর তাই আমার বাবা অভিমান করে আমার সাথে শেষ কথা না বলেই চলে গেলেন। আমি তাঁর আত্মার শান্তি কামনা করি।

# অভিক ও ঋদ্ধ সংগীত সাধক সাধন সরকার

## বিষ্ণুপদ সিংহ

প্রায় ৪০ বছর পিছিয়ে যেতে হবে আমাকে। ১৯৫৩ সাল ডিসেম্বর মান বিকেল ৪টা, থানার মোড়ে ম্যাগারপান বিড়ি সিগারেটের আর নস্যির দোকান, বাড়ী থেকে বেড়িয়ে হাটাত হাটতে দাড়িয়েছি এসে ম্যাসার দোকানের সামনে, ভাবছি কি করি কোথায় যাই, আমি তখন নদীর পাড়ে কালী বাড়ীর পাশে আমাদের বাড়ীতে থাকি আর তখন আমি বি এল কলেছে ২য় বর্ষের ছাত্র। ভাবছি কোথায় যাওয়া যায়, ঠিক তখনি দেখি সাধ:ান দা আসছেন পিকচার প্যালেনের দিক তেকে মানে তাঁর বাড়ী মির্জাপুর হতে। তিনি ও এসে দাঁড়ালেন থানার মোড়ে ম্যাসার দোকানের সামনে, পান খেলেন, পান নিলেন আর নস্যিও নিলেন। আমাকে দেখে একটু হেসে বললেন-কি খবর কেমন আছে।? যাচ্ছো কোথায় উত্তরে বললাম কোথায় আর যাবো, এই দাড়িয়ে আছি তখন তিনি বললেন, তা বেশ ভালম চল এক জায়গায় যাই দু:জনে বে হাটতে লাগলেন সোসাইটি সিমেনা রাস্তা ধরে তারপর বাংলাদেশ ব্যাংক রেখে সোজা এক পুরনো চারতলা বাড়ীতে দু'জনে পৌছলাম। বাড়ীর নাম "ফ্লোরা হাউস" এখন যেখানে ওয়েষ্টার্ণ হোটেল দাড়িয়ে আছে। ওটা সেই হলুদ রঙের পুরনো চারতলা বাড়ী ভেঙ্গে ঐ আধুনিক হোটেল হয়েছে।। এই ফ্লোরা হাউসের চারতলায় সেই প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক সন্দিপের সাপ্তাহিক সাহিত্য আসর বসতো। আমরা চারতলার উঠে ছিলেন কাঠের সিড়ি বেয়ে। ছোট্ট অন্ধকার ঘর, হুগলার পাটি পাতা ছিল এবং কেরাসিনের বড় একটা কুপি জলছিল বাড়ীরওয়ালা বিদ্যুৎ কেটে দিয়েছিলেন। সেই সময় অনেকে আসতেন, নাজিম মাহমুদ।হাসান আজিজুল হক, আবু বকর সিদ্দিকা, সাধন সরকার প্রদিস বিশ্বাস জহর সাহা, মুস্তাফিজ ভাই আরো অনেকে আসতো এমন ঠিক মনে পড়চ্ছেনা।সন্দীপনে মুলক আলোচনা হতো, মাহিত্য কবিতা ও গান অনেকে কবিতা পাট করতো আর ঐগুলো আলোচনা করার জন্য আমাকে হাসান আজিজুল হক দিয়ে বলতেন পরের সপ্তোহে আলোচনা করতো। সাধন দা এ ব্যাপারে ভীষণ উদ্যোগী ছিলেন। দাদা আমাকে অনুপ্রেরণা দিতেন। বলতেন আরে ভয় কিসের এখন থেকেই নেমে পর কবি হতে। বাসয়ে লখা গুলো নিয়ে যাও, ভাল করে পরে, চিন্তা করে নিজের মধ্যে বিশ্লেষণ করে হয় লিখে আনতে না হয় মুখে আলোচনা করবে। কবিতা হতো সল্প হতো, আলোচনা হতো গান হতো, সাধন দার গলায় সেই সব গলণ সঙ্গীত যা আজো ঐ ফ্লোরা হাউসের দেয়াল, ঘর বাড়ী তার চারপাশ প্রতিধ্বনিত হচ্ছে। গান নিয়ে কথা হতো দাদা খানের নতুন সর করতেন। গান রচনা করতেন নিজে সেই সব গান বহুবার নানান রাজনৈতিক মঞ্চে, প্রতিবাদে, প্রতিরোধে আর মিছিলে গাওয়া হয়েছে।

সাধন দা খুব সহজ সরল আত্ম বিশ্বাসের অটল ন্যায় ও নীতিতি কঠিন এক ব্যক্তিত্ব। মোটা কাপড়ের পাজামার, পাঞ্জাবি তা অবশ্য আধ ময়লা, বুকের বোতামও থাকতো ছেড়া। মোটা ফ্রেমের চশমা কালো চশমা বেশ গম্ভির, একটু রাশভারি, মাথা নিচু করে পথ চলেন। মাথার চুল প্রায় ধুসর হয়ে গেছে। জীবন যুদ্ধে তিনি এক সাহসী যোদ্ধা। নিজের অহংকার ও ব্যক্তিত্ব তাকে ভিন্ন মাত্রা দিয়েছিল। একটু এলোমেলো, কামা কাপড় খুব সাধারণ। তাঁর মধ্যে কোথাও নিজেকে গুছিয়ে তোলার ব্যাপার নেই। দেখা হলে বলতেন এই যে, কি ব্যাপার। হাসতেন এবং বলতেন কেমন আছো-কবিতা চর্চা টিকমতো বিষয়ের উপর বই, আর সন্দীপনের সাপ্তাহিক আসরে যাবা।

জীবন কেটেছে তাঁর মির্জাপুরের ছোট্ট পুরনো একতলা বাড়ীতে, স্ত্রী, পুত্র বৃদ্ধা মায়ের সঙ্গে। কখনো বাইরে যাননি, এই ছোট্ট শহরেই তার জীবন অতিবাহিত হয়েছে। কখনো অর্থ-নাম-যশ খ্যাতি প্রতিষ্ঠার কামনা তাঁকে এতটুকু টলাতে পারেনি। পুরনো জীর্ণ বাড়ী, গ্লামার নেই, লোনা ধরা, দেয়ালগুলো নড়বড়ে। কোথাও কোন বৃদ্ধির লক্ষন নেই। সাধন দা সবই দেখনে, কি অসাধারণ নিবের্দ তাঁর। উচ্চকাঙ্খাহীন, নিরুদ্যম বৈষয়িক বিফলতায় ভেঙ্গে পড়া মানুষের অসহায় নিশ্চেষ্টতা, নাকি সাধন দার প্রকৃতির মধ্যেই আছে নিরাসক্তি, নিস্পৃহতা আছে নির্বেদ্ জানিনা।

সাধন দা, ভারতীয় বৌদিকে গান শিখাতে যেতেন। তখন অসিতদারা পুলিশ লাইনের পশ্চিম গোলির মধ্যে এক বাসায় থাকতেন আমি প্রায় যেতাম অসিত দার বাসায় নানা বিষয় কথা হতো, একদিন সন্ধ্যায় সাধন দা এলেন কথায় কথায় তিনি গান ধরলেন তা ছিল প্রখ্যাত গজল শিল্পী মেহেদী হাসান অপূর্ব আর নান্দনীক গলায় গেলেন। গানের শেষে উর্দূ শব্দের সুন্দর অর্থ বাংলা করে দিলেন। দাদার গান আমি বহু শুনেছি, আসলে গান যেন তাঁর একটা জন্মগত ব্যাপার ছিল, কি সহজে, কি প্রমায় প্রজ্ঞায়, প্রজ্জুলে গান গাইতেন।সে কোন জায়গা থেকে সুর তুলতেন। সাধন দা উচ্চাঙ্গ গাইতেন। রবীন্দ্রসঙ্গীত ও গণসঙ্গিত গাইতেন। ১৯৬৩ সাল থেকে সাধন দার সাথে আমার পরিচয় খুব সহজ ও কাছের হতে থাকে, বিশেণ করে যে দিন দাদা আমাকের থানায় মোড় থেকে ডেকে সন্দীপনে নিয়ে গিয়েছিলেন, এবং সবার সাথে পরিচয় করে দিয়েছেলেন এই বলে আগামী দিনের এ এক কবি, একে আপনারা গ্রহণ করুন। সন্দীপন এমনি একটা সংগঠন যেখানে সাংস্কৃতি, শিল্প, সাহিত্য, রাজনীতি ও সংগ্রাম মিলে মিশে ছিলো। এতে যারা ছিলেন তাঁর সবাই স্বনামধন্য। মুস্তাফিজ ভাই মানে মুস্তাফিজুর রহমান, নাজিম মাহামুদ যার হাতে এই সন্দীপন গড়া। উভয়ের প্রসার বন্ধুত্ব ছিল। সেই মুস্তাফিজুর ভাই কত কাজ করেছেন এই সংগঠনকে বেগবান করতে। এই কাজে সাধন দা ছিলেন এক শক্তিশালী মানুষ, সব সময় বলতেন থেমে থেকোনা এগিয়ে চল।

একবার বিএল কলেজে একটা বড় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে সাধন দা বিশেষভাবে আমান্ত্রত হয়ে গিয়েছিলো গান গাইতে। আমাকেও কবিতার জন্য বলা হয়েছিল দাদা আমাকে দেখে একখানা হেসে, নাকে একদলা নস্যি নিয়ে বলেছিলেন অবশেষে তুমি কবি হলে, বেশ বেশ খুব ভাল, চালিয়ে যাও, থেমে থেকো না। এইসব কথা ভুলা যায় না। স্মৃতির পৃষ্ঠা থেকে এগুলো প্রায় বেড়িয়ে আসে। তাঁকে আমি কোন দিনও ভুলবো না। আমার কথা ছেড়ে দি, আমি সঙ্গীতজ্ঞ নই,ম সঙ্গীতের কিছুই বুঝি না, সাধন দা কত বড় শিল্পী তার পরিমাপ করা আমার সাধ্য নয়। তিনি কত একজন সংগীত শাস্ত্রজ্ঞ ও সংগীত শ্রোষ্ঠা তাও আমি জানি না। তবু এটুকু বলবো আমার ক্ষুদ্র বোধে তিনি ছিলেন একজন প্রতিভাধর, প্রজ্ঞা, সুরস্রষ্ঠা অসাধারণ শিল্পী। কিন্তু দুর্ভাগ্য এই ছোট্ট মফস্বল শহরে তার খুনের কদর হয়নি।

তাঁর স্বীকৃতিও হয়নি একজন ধ্রুপদী সঙ্গীতজ্ঞ হিসাবে। তিনি বলতে গেলে দিলেন নিঃসঙ্গ, তাই অনাদার, অবহেলা, নিষ্ঠুর নির্যাতন ও অবজ্ঞা পেয়েছেন এই সমাজ থেকে। কিন্তু অবাক হতে হয় ভেবে তাঁর অনেক বড় বড় লোক গানের ছাত্র ও ছাত্রী ছিলো। আমি অনেককে জানি, যারা অনেক উপরে অবস্থান করছেন। সমস্ত জীবন দারিদ্রের সাথে যুদ্ধ করেছেন, ছিল অনেক অভাব, এই অভাব কুরে কুরে খেয়েছে তাঁর বাড়ীঘর আসবাবপত্র সব কিছু, তবুও তিনি কখনো কাউকে অভিযোগ করেননি আমাদের সাধন দা জীবনে রোদ্দুর হতে চেয়েছিলেন, কিন্তু তা হয়নি। অনেকে তাঁর কাছ থেকে সেই রৌদ্রের আলো নিয়ে নিজেদের জীবন আলোকিত করছেন। মনে পড়ে তাঁর গাওয়া সেই বিখ্যাত গান যা পাকিস্তান জান্তার বিরুদ্ধে উচ্চারিত হয়েছিল। বেরিকেড বেয়নেট বেড়াজাল। স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় উত্তাল দিন গুলিতে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে পরিবেশিত্ নাজিম মাহমুদের ধ্বংসের পরোয়ানা শোন কি, গানটিতে সাধন দা চৌনিক সুরের সংমিশ্রণ ঘটিয়েছিলেন। তাঁর সুর করা বেশ কবকটি গণ সঙ্গীত বিখ্যাত হয়ে আছে আজো আমাদের হৃদয়েও বোধে যেমন বজ্রকঠিন শপথ এবার জাগো ওঠ জাগো একুশে সকাল রক্তলাল, কমরেড এই রাত আঁধিয়ার, আমাদের চেতনার সৈকতে, ধন্য মাগো তোমার ধুলো ইত্যাদি। তাঁকে অনেক সংগঠন সম্বর্ধনা দিয়েছে, কবিতালাপ পদকও সন্মান দিয়ে ঋণ শোধ করেছে। জীবনে বহু চড়াই উতড়াই পেরিয়ে এসেছেন এই ধ্বত্বিক শিল্পী। মৃত্যু তাঁকে হাতছানি দেয়, দিনে দিনে তার চোখের আলো নিভে আসে। একদিন আমাদের ছেড়ে, এই পার্থিব জগত পিছনে রেখে তিনি অনন্তের পথে যাত্রা করেন। ১৯৯২ এর ১৫ জুন বাংলার ১লা আষাঢ়, কালিদাসের সেই কথায় "আষাঢ়স্য প্রথম দিবসে" এই অভিক, ঋদ্ধ সংগীত ও সংস্কৃতির যোদ্ধা আমাদেরকে ছেড়ে চলে গেলেন। বলে গেলেন যখন মানুষ মানুষকে ভালবাসবে তখন প্রত্যেকে কবি।

# খুলনার সংগীত ব্যক্তিত্ব সাধন সরকার

## হুমায়ুন কবির

তখন উপ-মহাদেশের বাংলা গানের গীতিকার গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার, পুলক বন্দোপাধ্যায়, শ্যামল গুপ্ত প্রমুখদের গানে সুর করে হিমাংশু দত্ত, শৈলেন দত্ত, শচীনদেব বর্মন, কমল দাসগুপ্ত, অনুপম ঘটক প্রমুখ সুরকারগণ বাংলা গানকে সুরে ও রসে কানায় কানায় ভরে তুলেছেন। আর এদিকে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে তখন বাংলা গানের গীতিকার, সুরকার ও শিল্পীদের চরম আকাল চলছে। ঢাকায় তখন সুরকার হিসাবে আব্দুল আহাদ,,বেদারুদ্দিন আহম্মেদ, আব্দুল লতিফ প্রমুখ শিল্পীগণ কিছু কিছু বাংলা আধুনিক গানে সুর করতেন। ওস্তাদ মোহাম্মদ হোসেন খসরুও সুর করতেন তবে উচ্চাঙ্গ সংগীতকেই তিনি প্রাধান্য দিতেন বেশি। অথচ এ সময় সংগীত শ্রোতাদের বিশ্লেষণধর্মী শ্রবণ ক্ষমতা ছিল অত্যন্ত তীক্ষ্ণ এবং সংগীত রসে নিষিক্ত। সংগীতের চুলচেরা বিশ্লেষণে তারা ছিলেন অত্যন্ত পাকা। কারণ শিল্পী হিসাবে তখন উপমহাদেশের বাংলা গাকে মাতিয়ে রেখেছেন শচিন দেব বর্মন, জগন্ময় মিত্র পংকজ মল্লিক , হিমাংশু দত্ত, ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য্য, শৈলদেবী, পান্নালাল ভট্টাচার্য্য, হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়, সুপ্রীতি ঘোষ, উৎপলা সেন, প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায়, ইলা বসু প্রমুখ শিল্পীগণ।

এ রকম এক শূন্যতার মাঝে ৫০ এর দশকের গেড়ার দিকে শিল্পী হিসাবে খুলনায় প্রথম সাধন সরকারের আত্ম প্রকাশ ঘটে। শুধুমাত্র রবীন্দ্র, নজরুল জয়ন্তীর সীমা ছাড়িয়ে তখন ক্রমশঃ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের বিস্তৃতি ঘটতে শুরু করেছে। বিভিন্ন পর্ব ও দিবসের উৎসব আয়োজনের এ সময় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের অপরিহার্য্যতা দিন দিন বাড়তে থাকে তার কণ্ঠ, গানে কথায় ও সুরে সর্বোপরি গায়ন শৈলী শ্রোতা দর্শকদের চুম্বকের মত আকর্ষণ করতে থাকে। অনুষ্ঠান হলে এবং সেখানে সাধন সরকার না থাকলে শুধু অনুষ্ঠানের অপূর্ণতাই নয়, সেটা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হিসাবেই বিবেচিত হত না। কিন্তু এ সময় দ্বিজাতি তত্ত্বের কিছু ধারক বাহক ভারতীয় শিল্পীর গাওয়া বাংলা গানকে এক রকম অচ্ছুৎ হিসাবে সাব্যস্ত করেন। ফলে যুগ সন্ধিকাল স্বদেশী গীতিকারদের গানে সুর করে এবং পরিবেশন করে সাধন সরকার এই ক্রান্তিকাল অতিক্রমের পথ আবিস্কার করেন। যতদূর জানা যায়, সাধন সরকার সে সময়ের কবি ও গীতিকার রওশন আলির লেখা গানে প্রথম সুর করেন। পরবর্তীতে পর্যায়ক্রমে তিনি এম এ রমজান, কাওছার হোসেন আবুল বাশার, উৎপল বন্দ্যোপাধ্যায়, গৌরি হাজরা, ফিরোজা বেগম, মির্জা শরফুল হোসেন, নগেন দাস, আবু বকর সিদ্দিক, নাজিম মাহমুদ, সুশান্ত সরকার, অচিন্ত্য কুমার ভৌমিক প্রমুখ সফল কবি ও গীতিকারদের অসংখ্য গানে গোটা ৫০ ও ৬০ এর দশক সুর করে এক রকম ভারতীয় বাংলা গানের সাথে পাল্লা দিয়েই টিকে ছিলেন। এসব গীতিকাররা মূলত সাধন সরকারের জন্যই গান লিখতেন আর সাধন সরকার এসব গানে সুর করে এবং বিভিন্ন অনুষ্ঠানে পরিবেশন করে খুলনার সাংস্কৃতিক অংগন মাতিয়ে তোলেন। তবে তার প্রথম পর্যায়ের গানগুলির সুরে বেশ কিছুটা রবীন্দ্র সংগীতের সুরের প্রভাব জড়িত ছিল। যেমন এ সময়ের গান এ রমজানের লেখা স্বপন ভরা শ্রাবণ রাতে, উৎপল বন্দোপাধ্যায়ের বালুচরে বাসা বেঁধে মিছের স্বপন কিংবা "কবরী সাজালে কেন কনক চাঁপাতে" প্রভৃতি। আবার রবীন্দ্র প্রভাবমুক্ত মোতাহার হোসেনের লেখা শারদ প্রভাতে শেফালিকা সম, "নয়নে শিশির ঝরে"। উল্লেখ্য সংগীতজ্ঞ কালীপদ দাস ১৯৫৩ সালে এই গানটি গেয়ে খুলনা জেলা পর্যায়ে সংগীত প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অধিকার করেন। এছাড়া এম এ রমজানের "ব্যাকুল পৃথিবী মানুষের ভিড়ে " উৎপল বন্দ্যোপাধ্যায়ের "নাইবা এলেই ফাগুনে" প্রভৃতি গানগুলি ছিল এ সময়ের বিশেষ উল্লেখ্যযোগ্য। এ সময় তার আরো কিছু ব্যতিক্রমধর্মী সৃষ্টি ছিল মীর্জা শরফুল হোসেনের লেখা "জীবনটা রয়ে যাবে অচেনা" টুটুল চৌধুরীর "আকাশটা চিরদিন রবে কি", এবং আবু বকর সিদ্দিকের "আমি গেয়ে যাই এই মোর শেষ গান"। নগেন দাসের "নদী তুমি বলেছিলে গান শোনাবে" এবং "কাজল কালো বরণ হরিণ চোখে" গানগুলি। মীর্জা শরফুল হোসেনের লেখা "জীবনটা রয়ে যাবে অচেনা" এবং আবু বকর সিদ্দিকের "আমি গেয়ে যাই এই মোর শেষ গান" গান দুটি গেয়ে হারুনর রশিদ ব্যাপক প্রশংসা পান ও অসংখ্যবার পুরস্কৃত হন।

১৯৫২ এর ভাষা আন্দোলনের পটভূমিকায় তখন পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক অবস্থা বেশ উত্তপ্ত। এরই ধারাবাহিকতায় খুলনার বেশ কিছু প্রগতিশীল সাংস্কৃতিককর্মী ও বুদ্ধিজীবীদের প্রচেষ্টায় খুলনার সামছুর রহমান রোডে ১৯৬৩ সালের ২৮ সেপ্টেম্বর সন্দীপণ নামে একটা সাংস্কৃতিক সংগঠন স্থাপিত হয়। সংগঠনটির মুল উদ্যোক্তা ছিলেন খুলনার সাংস্কৃতিক আন্দোলনের অগ্রপথিক নাজিম মাহমুদ, অধ্যাপক খালেদ রশিদ (গুরু) সংগঠনের কার্যক্রমে এক নবতর মাত্রার সংযোজন করেন। ১৯৫৪ সালের যুক্তফ্রন্টের স্পীকার আব্দুল হাকিম ছিলেন সংগঠনটির প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি। সন্দিপন ছিল সে কালের খুলনার স্থানীয় প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবি সম্প্রদায়ের ভাব বিনিময়ের একমাত্র সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান ও একটি পরিবার। সাধন সরকার ছিলেন সংগঠনটির মুল নেতৃত্বে ও অনুষ্ঠান পরিকল্পনায়। মিছিলের গান বাধা সুর করা ঘন্টার পর ঘন্টা রিহার্সেল করা, অন্যান্যদের উদ্বুদ্ধ করা, সব কিছু মিলে তখন সাধন সরকার ছিলেন এক অন্য মানুষ। সন্দিপণকে নিয়ে তার সুর করা গান ছিল সন্দিপন সন্দিপন সন্দিপন সম্পৃতি আর সৌহার্দের সম্মিলন।

১৯৪৭ এর দেশ বিভাগের পর এবং দ্বিজাতি তত্ত্বের মোহভঙ্গের পর বাংগালী সংস্কৃতিকে লালন করার মানসে এদেশের প্রগতিশীল রাজনৈতিক কর্মী ও গুণীজন যখন পাকিস্তানী উর্দুভাষী শাসকদের শৃঙ্খল মুক্ত হবার চিন্তা করেছেন। ঠিক তখনই পঞ্চকবি থেকে শুরু করে সলিল চৌধুরী হেমাংগ বিশ্বাস, পরেশ ধর, অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় দীলিপ সেনগুপ্ত ও ভারতীয় গননাট্য সংঘের অপরাপর সুরকারদের অনুকরণে সাধন সরকার সন্দিপন প্রতিষ্ঠার পর এখানে বসেই গনসংগীতের সুর করা শুরু করেন।

এদেশের তখন একমাত্র আলতাফ মাহমুদ ছাড়া অন্য কোন শিল্পী প্রকৃত গনসংগীতের উল্লেখ্যযোগ্য কোনো সুর করেছেন এমন তথ্য জানা যায় না। অধ্যাপক আবু বকর সিদ্দিক রচিত গণসংগীতের ভাষা বা বাণী ছিল অত্যন্ত জটিল ও অস্বাভাবিক। অথচ এই বাণী ও সুরের মাধুর্য্যকে সাবলীল করে তুলেছেন সাধন সরকার। যেমন পাকিস্তান বিরোধী তার একটা গণসংগীত "বেরিকেড বেয়নেট বেড়াজাল"। স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় উত্তাল দিনগুলিতে স্বাধীন বাংলা বেতারকেন্দ্র থেকে পরিবেশিত এই গণসংগীতটি অনেকেই শুনে থাকবেন। গানটির আরো কয়েকটি স্থান যেমন "পাকে পাকে তড়পায়" ও "ছিঁড়ে খুঁড়ে খাবলায় নরপাল" প্রভৃতি শব্দ বেশ গদ্যল। আবার নাজিম মাহমুদের "ধ্বংসের পরোয়ানা শোন কি" গানটিতে সাধন সরকার চৈনিক সুরের অনুপ্রবেশ ঘটিয়েছেন। কিন্তু শ্রোতাদের কাছে বাংলা গানের সুরের মধ্যে তেমন কোন বাঁধার সৃষ্টি হয়নি। তার সুর করা আরো কয়েকটি গণ সংগীত যেমন বজ্রকঠিন শপথ এবার, সূর্য্যের গৌরব বক্ষে, একক দশক শতক সহস্র কোটি জনতা, কমরেড এই রাত আঁধিয়ার, দেয়ালে দেয়ালে লটকে দাও, জাগো ওঠ, জাগো একুশে সকাল, রক্ত তিলক ললাটে সূর্য্য, আমাদের চেতনার সৈকতে, ধন্য মাগো তোমার ধুলো, একটুখানি আলো, কৃষ্ণচূড়া আর রক্ত পলাশের রঙিন জাল বুনে, প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। এছাড়া সাধন সরকার সন্দিপনে বসেই পাকিস্তানি শোষণ নিপীড়ন বিরোধী গান, ভাষা আন্দোলনের গান, যুদ্ধ বিরোধী গান শান্তির গান প্রভৃতি অসংখ্য গানে সুর করেন। এই সব গান তখনকার সাংস্কৃতিক অংগন তথা রাজনৈতিক আন্দোলনে ব্যাপক গণজোয়ার সৃষ্টি করেছিল।

সাধন সরকার সুরারোপিত আমরা কানে দিয়েছি তুলো, গায়ে মানেনা আপন মোড়ল, আমাদের নানা মত নানা দল প্রভৃতি গানে পল্লীর কাছে শহরের এবং শহরের কাছে পল্লী সুরের সংমিশ্রন ঘটানো। সত্তর দশক তার সুরারোপিত কয়েকটি ছড়াগান যেমন ধান কোথায় গো মা আমার ক্ষেতে, নীল আকাশে কাজ চিলেরা (রোকনুজ্জামান খান) কোন দেশেতে তরুলতা (সতেন্দ্রনাথ দত্ত) প্রভৃতি ব্যাপক জনপ্রিয়তা পেয়েছিল। এই গানগুলি তিনি ছোটদের শেখাতেন। এ প্রসংগে উল্লেখ্য, যে ১৯৬০ এর দশকে সন্দিপনে যখন ছোটদের গান শেখানোর ব্যবস্থা হয়। তখন ছোটদের শেখানোর মত সব সুর করা তেমন কোন ভাল ছড়াগান পাওয়া কষ্টকর ছিল। তখন কাজী নজরুলের তিনখানা বইতে ৮০/৮৫টি গানের ছাড়া পেয়ে সাধন নিজে তাতে জলদ দাদরা তালে সুর করেন। গানে সুর করার পর ছোটদের পরিবেশনায় ব্যাপক জনপ্রিয়তা পায় এবং নাসিমা নামের একটা মেয়ে ঐ গানটা গেয়ে বেশ কয়েকবার পুরস্কার ও পায়। তার সুর করা ছোটদের গানের বিশেষত্ব ছিল প্রাথমিক স্তরে কণ্ঠ সাধনার সরগম গতের সাথে মিল রেখে এর স্বর বিন্যাস করা। যেমন সা রা গা মা গা রা সা, রা পা মা পা, পা সা পা রা অথবা সা পা রামা সাপা বা সারা গা গা রা সা ইত্যাদি। যা ছিল সাধন সরকারের নিজস্ব উদ্ভাসিত ঢং।

বিভিন্ন গানে সুর করার বিষয়ে জানা যায়, তিনি প্রাথমিক ভাবে গানের বাণীকে বার বার করে পড়ে তা সম্পর্ণরূপে আত্মস্থ করার চেষ্টা করতেন এবং কোন গানের সুরকে নকল না করে শুধু মাত্র নিজের বোধ থেকে ক্লাসিক্যাল বা রাগ ভাংগা সুর হতে নতুন সুর সৃষ্টি করতেন। তার রচিত ও সুরারোপিত আইরিশ সুর সংমিশ্রণের গান মেঘ জমেছে ঝড় এসেছে এবং ও 'ভাই কম জনেছে ধান' ব্যতিক্রমী সৃষ্টি।

এ প্রসঙ্গে সংগীতজ্ঞ কালিপদ দাস বলেন, সাধন সরকারের কণ্ঠস্বর এবং মানসিকতার ধরণ আমাদেরকে পল রবসনের কথা মনে করিয়ে দেয়। পল রবসনের ওল্ড কেনটাকি হোম' বা 'জন ব্রউন বডি' প্রভৃতি গানের সাথে সাধন সরকারের কমরেড এই রাত আধিয়ার। একটু খানি আলো' গায়ে মানেনা আপনি মোড়ল। প্রভৃতি গানের কথা মনে করিয়ে দেয়। বস্তত সাধন সরকারের গণসংগীতের মধ্যে দিয়েই আমরা তাকে পাই একজন সমাজ সচেতন আপোষহীন মানবপ্রেমী প্রগতিশীল শিল্পী হিসাবে। সত্তর দশক ছিল সাধন সরকারের সুর পরীক্ষা নিরীক্ষার চূড়ান্ত পর্ব। এ সময়ে তিনি চর্য্যাপদ, মধু সুদন কাব্য, সুকান্তের গীতি কবিতা 'অভিযান' এর গীতিনাট্যরূপ দেন। কবি কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদারের কবিতায় সুর সন্নিবেশ প্রভৃতি কাজগুলো করেন। খাম্বাজ ঠাটের উপর ভাটিয়াল সুরকে বসিয়ে সৃষ্টি করেন রাগ ভাটিয়াল। জন্ম সূত্রে সাধন সরকার ছিলেন ভাটি অঞ্চলের মানুষ। ভাটির নদী ও দেশ তার মনের অনেকখানি জুড়ে ছিল। আর নিজস্ব সংস্কৃতি হিসাবে ছিল ভাটিয়ালি গান। এই ভাটিয়ালি গানের সুরকে আশ্রয় করে তিনি সৃষ্টি করেন 'রাগ ভাটিয়াল'। যা ছিল সাধন সরকারের এক অসাধারণ অনবদ্য সৃষ্টি।

আশির দশকে তিনি তার উল্লেখযোগ্য আধুনিক গানে সুর করেন । যা বাংলাদেশ বেতার, খুলনা থেকে গায়ক গায়িকা দিয়ে পরিবেশিত হয়। অধ্যাপক অচিন্ত্য কুমার ভৌমিকের গীতি নাট্য 'সমশের বাওয়ালী' তে তিনি গ্রাম্য পল্লীসুরে শহুরে পল্লী সুরের সংমিশ্রন ঘটিয়ে এক নবতরন সুর আবিস্কার করেন।

তখন 'পূর্ণিমা সন্ধ্যা' বলে একটা অনুষ্ঠান হত। এমনি এক ঘরোয়া অনুষ্ঠানে তিনি বাংলা সংগীতের ধারা নামে একটা অনুষ্ঠান করেন। তার ছাত্র ছাত্রীসহ তিনি নিজের চর্য্যাপদ থেকে শুরু করে রবীন্দ্র, নজরুল অতুল প্রসাদ রজনীকান্ত, দ্বিজেন্দ্র লাল হয়ে সুকান্ত, জীবনানন্দ, সিকান্দার আবু জাফর পর্যন্ত সংগীতের বিভিন্ন ধারার সংমিশ্রণ ঘটান। তিনি নিজে মধুসুদনের রেখ মা দাসেরে মনে পরিবেশন করেন।যা তখনকার সংগীত সমাজে ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করে। এ অনুষ্ঠানে তিনি পর্যাপদ মঙ্গলকাব্য থেকে শুরু করে বর্তমান সময় পর্যন্ত বিজ্ঞানমনস্কতায় বিজ্ঞজনের পরিচয় দেন।

২১ ফেব্রুয়ারীতে সারা দেশে যখন আলতাফ মাহমুদের সুর করা বহু প্রচলিত শহীদ দিবসের একমাত্র গান আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারী গাওয়া হত, খুলনার তখন গাওয়া হত সাধন সরকারের সুর করা শহীদ দিবসের গান জাগো ওঠ জাগো একুশে সকাল রক্তলাল। এছাড়া আমাদের চেতনার সৈকতে, কৃষ্ণচূড়া আর রক্ত পলাশের রঙিন জালবুনে এসব গানও পাওয়া হত। সে সময় ভিয়েতনামের যুদ্ধে মার্কিন সম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে তার সুর করা গান ধ্বংসের পরোয়ানা শোন কি ব্যাপকভাবে গাওয়া হত।

১৯৭৫ সালের জুন মাসে রবীন্দ্রসংগীত সাধক শিল্পী,শৈলজারঞ্জন মজুমদার খুলনায় আসেন এক সপ্তাহের রবীন্দ্রসংগীত প্রশিক্ষণ দিতে। থাকতেন চেয়ারম্যান গাজি শহিদুল্লাহর হাজি মহসিন রোডস্থ পৌরসভার বাড়িতে।তিনি প্রশিক্ষণের জন্য দশজন শিল্পী মনোনীত করেন। এদের মধ্যে সবচেয়ে বয়স্ক ছিলেন সাধন সরকার। প্রশিক্ষণ শেষে তিনি এই শিল্পীদের দিয়ে খুলনা ক্লাবে একটা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন। অনুষ্ঠান শেষে সাংবাদিক মাহমুদ আলম খান শৈলজারঞ্জন মজুমদারকে সাধন সরকার কেমন শিল্পী জিজ্ঞাসা করেন। জবাবে তিনি বলেন তোমাদের খুলনার সৌভাগ্য যে রবীন্দ্রসংগীতের একজন অনন্য শিক্ষক ও শিল্পী তোমরা পেয়েছ। এই ধরণের শিল্পী বিরল। শৈলজারঞ্জন সাধন সরকারকে অকুণ্ঠ প্রশংসা করেন।

আফ্রো এশীয় লেখক সমিতির উদ্যোগে ঢাকায় ইঞ্জিনিয়ার্স ইনষ্টিটিউটে তিনদিন ব্যাপী এক অনুষ্ঠানে সন্দীপনের ডাক পড়ে। সাধন সরকারে সুরে এখানে সবগুলোই গণসংগীত পরিবেশন করা হয় এর মধ্যে নাজিম মাহমুদের রচিত একটা গান ছিল। গায়ে মানে না আপনি মোড়ল চৌকিদার, যখন তখন গর্জে ওঠে খবরদার। এই খবরদার শব্দটি এমনভাবে সুর করা হয় যাতে পাকিস্তানের তৎকালীন শাসক গোষ্ঠীকে এক ধরণের ভয় দেখানো হয়। শ্রোতারা বিস্ময়ে হতবাক হন এবং পরদিন দৈনিক পাকিস্তান পত্রিকার প্রথম পাতায় শিল্পীদের ছবিসহ ফলাও করে অনুষ্ঠানের সংবাদ ছাপা হয়।

সাধন সরকার ৫০ এর দশকে তার সুরারোপিত গান আবুল বাশার রচিত আমার আকাশে আজ মোহন ধ্বনি বাজে গানটি গেয়ে জাতীয় পর্যায়ে ২য় পুরস্কারে ভূষিত হন। শেষ বেলায় তাকে জাতীয় রবীন্দ্রসংগীত সম্মিলন পরিষদ ঢাকা, থেকে পদক ও অর্থ প্রদান করা হয়। এছাড়া শিল্পকলা একাডেমী ঢাকা থেকেও পদক ও অর্থ প্রদান করা হয়। এছাড়া শিল্পকলা একাডেমী, পৌরসভা শতবর্ষ উদযাপন কমিটি, খুলনা তৃণমুল থিয়েটার ফোরাম পরিষদ খুলনা এর পক্ষ থেকে তাকে সন্মাননা জানানো হয়। তিনি খুলনা বেতারের জন্মলগ্ন থেকেই ১ম শ্রেণীর সংগীত শিল্পী ছিলেন এবং দীর্ঘদিন সংগীত শিক্ষার আসর পরিচালনা করেছেন। সাধন সরকার স্থানীয় ভাবে খুলনায় সংগীততাচার্য্য হিসাবে পরিচিতি পান।

১৯৬৬ সালে খুলনা পৌর মিলনায়তনে চীন মৈত্রী সমিতির সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে সে সময়ের চীনা কাউন্সিলর উপস্থিত ছিলেন। এই অনুষ্ঠানের সাধন সরকার চীনাগানের সুর অবিকৃত রেখে বাংলায় পরিবেশন করেছিলেন। শুনে কাউন্সিলর ভীষণ খুশি হন এবং সাধন সরকারকে ব্যাপক প্রশংসা করেন।

সাধন সরকারের মৃত্যুর পর রাজশাহী থেকে সম্পূর্ণ অপেশাদার শিল্পীদের দিয়ে তার সুর করা গানের একটা ক্যাসেট প্রকাশিত হয়। তার গানের কিছু স্বরলিপি খুলনার স্কুল অব মিউজিকে রক্ষিত আছে এবং নাজিম মাহমুদের চেতনার সৈকতে গ্রন্থের মুদ্রিত হয়েছে। এছাড়াও ব্যক্তিগত পর্যায়ে সাধন সরকারের অনেক সুর করা গানের স্বরলিপি অনেকেই যক্ষের ধনের মত আগলে রয়েছেন বলে জানা যায়।

সাধন সরকার প্রথম গল্প এবং পরে কবিতা ও গান লিখেন। তার রচিত ছোট গল্প যেমন স্বপ্ন ভংগ , যোগফল বস্ত সজাগ, কৃষ্ণ গোলাপ প্রভৃতি। নাটক প্রসূন প্রত্যয় ভাঙা চশমা ইত্যাদি কবিতা সেই আমার প্রেম।

বাংলা ১৩৬৯ সালের ২৭ অগ্রহায়ণ সাধন সরকার মাদারীপুরের বাজিতপুর গ্রামের রমেশ চন্দ্র দাসের কন্যা মাধুরীকে তার পছন্দ হলে তিনি সরাসরি রমেশ বাবুকে প্রশ্ন করেন মেয়ে দেবেন আমি কিন্তু গান করি? তথাপি রমেশ বাবু রাজী হন এবং বিয়েও সম্পন্ন হয়। শ্বশুর ও শ্বাশুড়ীর বাড়ির সবাইকে কথার ফুলঝুরিতে মাতিয়ে রাখতেন। একবার শ্বশুর বাড়িতে পাটের চট দিয়ে মশারী তৈরি করেছিলেন গরুকে মশার হাত থেকে রক্ষা করার জন্য।

১৯৭১ সালের স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় সাধন সরকার জীবন বাঁচানোর জন্য শ্বশুর বাড়ি চলে যান। সেখানে বেশ কিছুদিন আত্মগোপন করে থাকার সময় ডাকাতের হাতে সর্বস্ব খুইয়ে এবং পিঠে ও কানে আঘাত প্রাপ্ত হয়ে মুক্তিযুদ্ধের শেষ দিকে ভারতে পাড়ি জমান। কলকাতার ১৪৪ লেনিন স্মরণীতে যখন সংগীতজ্ঞ কালিপদ দাসের পরিচালনায় বাংলাদেশের শিল্পীদের সমবেত কণ্ঠের বেরিকেড বেয়নেট বেড়াজাল গানের মহড়ায় মুখরিত ঠিক তখনই এগানের সুর স্রষ্টা সামান্য একটি আশ্রয়ের আশায় কলকাতার জনারণ্যে দিশেহারা হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন।গীতিকার নগেন দাস তাকে আবিস্কার করেন এবং বিজয়গড়ে পুনর্বসিন করেন।

সাধন সরকার ছিলেন একজন নিরহংকারী মানুষ। সারাটা জীবন খুলনা শহরে সাদামাটা ভাবে জীবন যাপন করে গেছেন। খুলনা তথা সারা বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক অঙ্গণের এক অপ্রতিদ্বন্দ্বী শিল্পী সংগ্রামী সাধন সরকার আজো মিশে আছেন আমাদের অস্তিত্বে, স্বপ্নে,প্রেমে।